অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। দুরুদ ও সালাম প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

হজরত মাওলানা আসলাম শেখোপুরি রহ. ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা বুজুর্গ, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক। তিনি প্রতিষ্ঠিত এক আলেমে দীন। তাঁরই অমর কীর্তি এই কিতাবটি। মূল কিতাবটি উর্দু ভাষায় রচিত।

একজন মুমিনের উত্তম গুণাবলির সাজানো-গোছানো ও উদ্ধৃতি-সংবলিত যে বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা সত্যিই মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী। যা পাঠকের মন কেড়ে নেয় সহজেই। মুমিনের উত্তম গুণাবলির সঠিক ধারণা আমাদের সমাজে খুব কম মানুষেরই আছে; কিংবা নেই বললেই চলে। যারা জানেন, তাঁদের মধ্যেও এমন চরিত্রবান মুমিনের সংখ্যা অতি স্বল্প। অথচ রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্রকে ঈমানের পূর্ণতা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ বলেন, মুমিনদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঈমান তারই, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।[১]

অন্য এক বর্ণনায় উত্তম চরিত্রের মুমিনকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন বলা হয়েছে। উত্তম চরিত্রের কারণে একজন মুমিন শুধু মানুষের কাছেই নয়, প্রাণীদের কাছেও

১. মুসনাদে আহমাদ ১২/৩৬৪

প্রিয় হয়ে ওঠে। উত্তম চরিত্র এমন এক গুণ, যার কারণে অসংখ্য দোষত্রুটি ঢাকা পড়ে যায়, আবার এর অভাবে বহু ভালো গুণও চোখের আড়ালে চলে যায়।

আজকের মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো নৈতিক অবক্ষয়। এই নৈতিক অধঃপতন শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক জীবন, পারিবারিক বন্ধন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। এমন এক দুর্দিনে এই কিতাবটি যেন রোদ্দুরে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া জমিনে বৃষ্টি হয়ে নেমে এসেছে। যেমন কৃষক বৃষ্টিতে আনন্দে আত্মহারা হয়, তেমনি এই বই মুসলিম সমাজে নবজাগরণের বার্তা আনবে, প্রতিটি শব্দে জাগ্রত করবে হৃদয়ে আশার আলো, সৎ পথে চলার দৃঢ় সংকল্প, উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার প্রেরণা।

বইটি প্রতিটি মুসলমানের ঘরে থাকা দরকার, এই অনুভব থেকেই আমি এর বাংলা অনুবাদ করার প্রয়োজন বোধ করেছি। এটি প্রচলিত অনুবাদগুলোর তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। ইতিহাসভিত্তিক বইয়ের ভাষা সাধারণত কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু এতে ভাষা সহজ ও সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সব শ্রেণির পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন। লেখকের ভাব ও মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

শুকরিয়া জানাই মাওলানা আশিকুর রহমান ভাইকে, যিনি বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সর্বোচ্চ যত্ন নেওয়ার পরও কিছু ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও পরামর্শ কামনা করছি। রব্বে কারিম আমাদের সবাইকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আরজগুজার
মাওলানা ইসমাইল হোসাইন
শিক্ষক, জামিআ ইসলামিয়া চরওয়াশপুর মাদরাসা
কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

সম্পাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের, যিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা, তথা 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তিনি কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।[২]

সৌন্দর্য কেবল বাহ্যিক রূপের বিষয় নয়; বরং প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত থাকে মানুষের চরিত্রে। মূলত অন্তরের সৌন্দর্যই মানুষকে প্রকৃত অর্থে মহান করে তোলে। রূপ-ঐশ্বর্য থাকলেও যদি চরিত্র কলুষিত হয়, তবে সে শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু যার চরিত্র সুন্দর, সে-ই আসল সৌন্দর্যের মালিক।

আজকের সমাজে সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে চরিত্রের সংকট। মানুষ দিন দিন বুদ্ধিতে চতুর হচ্ছে, উন্নত বিশ্ব গড়তে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হৃদয়ে শুষ্কতা বাড়ছে। সততা, লজ্জাশীলতা, আমানতদারিতা ইত্যাদি গুণ হারিয়ে ফেলছে সমাজ। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন,

আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য।[৩]

এতেই বোঝা যায়, নবিজির মিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মানবচরিত্রকে গঠন করা, পরিশুদ্ধ করা, সুন্দর করা।

---

২. সুরা আত-তিন, আয়াত ৪

৩. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস: ৮৯৫২

‘কুরআন ও হাদিসের আলোকে মুমিনের উত্তম চরিত্র’ বইটি সেই লক্ষ্যেই সাজানো হয়েছে। বইটি হাতে নিলে পাঠক দেখবেন, কুরআন ও হাদিসের আলোয় চরিত্র গঠনের বাস্তব দিকনির্দেশনা। প্রতিটি অধ্যায়ে আছে আত্মশুদ্ধির সবক, নফসের চিকিৎসা ও আচরণ সংশোধনের উপায়। পাঠকের মনে হবে, বইটি যেন এক আয়না, যেখানে নিজের ত্রুটি দেখা যায় এবং সংশোধনের পথ চেনা যায়।

যদি এই গ্রন্থটি পড়ার পর একজন মানুষও নিজেকে বদলাতে চায়, তাওবার পথে ফিরে আসে, আর নবিজির আদর্শ চরিত্রকে জীবনের লক্ষ্য বানায়, তাহলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি এই বইটিকে লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও সম্পাদক, সবার জন্য হেদায়েত ও কল্যাণের উসিলা বানিয়ে দিন। তিনি যেন আমাদের অন্তরকে তাঁর নুরের আলোয় ভরিয়ে দেন, আর আমাদের আমলকে নবিজির চরিত্রের সুবাসে সুরভিত করে দেন।

সাজ্জাদ হুসাইন
খেজুরবাগ, কেরাণীগঞ্জ
১৫-১০-২০২৫, বুধবার

সূচিপত্র

আনুগত্য	১১
কাকুতি-মিনতি	১৫
সংঘবদ্ধতা	১৯
ইহসান	২৩
ভ্রাতৃত্ব	২৭
বিনয়	৩১
ঈমান	৩৫
ইখলাস	৪০
উত্তম চরিত্র	৪৪
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ	৪৮
আল্লাহর সন্তুষ্টি	৫২
ইস্তিকামাত	৫৫
ইস্তিগফার	৫৯
পবিত্র জীবন	৬২
আত্মসমর্পণ	৬৬
ইচ্ছাশক্তি	৬৯
আদব	৭৩
মানুষের সম্মান	৭৭
নেক আমল	৮১
পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ	৮৫
রোনাজারি-কান্নাকাটি	৮৯
ইনসাফ	৯৩
আল্লাহর পথে ব্যয় করা	৯৭

অল্পেতুষ্টি	১০১
নীরবতা	১০৫
তাদাব্বুর	১০৯
পাঁচটি মহৎ গুণ	১১৫
হালাল রুজি উপার্জন	১১৮
সৎকর্মের উপায়	১২২

আনুগত্য

আনুগত্যের শাব্দিক অর্থ হলো কারো পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা। পারিভাষিক অর্থে আনুগত্য বলা হয়, নবিজি ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে বর্ণিত ও প্রমাণিত বিষয়াদির অনুসরণ করে সে আলোকে জীবন পরিচালনা করা।[৪]

নবিজির কথা, কাজ ও সমর্থন দীন ও সুন্নাহর গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সমর্থন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেসব কাজ নবিজি ﷺ-এর সামনে সম্পাদন করা হয়েছে কিন্তু তিনি বাধা দেননি।

সুন্নাহ অনুসরণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা এবং তাঁর প্রিয়তম বান্দা হওয়ার প্রমাণ মেলে। এখানে হজরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রা.-এর একটি উক্তি তুলে ধরা খুবই সঙ্গত মনে করছি। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার নিদর্শন হলো, কুরআনুল কারিমকে ভালোবাসা। কুরআনুল কারিমকে ভালোবাসার নিদর্শন হলো, নবিজি ﷺ-কে ভালোবাসা। নবিজি ﷺ- কে ভালোবাসার নিদর্শন হলো তাঁর সুন্নাহকে ভালোবাসা।

আর উক্ত সবকিছুকে ভালোবাসার নিদর্শন হলো আখেরাতকে ভালোবাসা। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতকে ভালোবাসতে চায়, তাকে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা, কুরআনুল কারিম, নবিজি ﷺ-এবং তাঁর সুন্নাহকে ভালোবাসতে হবে।[৫]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

> (হে নবি) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের

৪. ইবনুল মনজুর কৃত লিসানুল আরব, ১/৪১৬,৪১৯
৫. তাফসিরে কুরতুবি, ৪/৪০

ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

এই আয়াতে কারিমাকে আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার আয়াতও বলা হয়। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট হলো, একবার কয়েকজন খৃষ্টান আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার দাবি করে। তখন তাদেরকে বলা হয়, যদি তোমরা এই দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তাহলে প্রমাণ পেশ করো। আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় ও সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ। ইবনুল কাইয়িম রহ. আয়াতটি উদ্ধৃত করে বলেন, নবিজির অনুসরণ ব্যতীত আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়।[৭]

প্রিয় নবিজির পর সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অন্য কোনো নবিরও যদি আগমন ঘটত, তবুও তাকে নবিজিরই অনুসরণ করতে হত। একবার হজরত ওমর ফারুক রা.-এর হাতে তাওরাতের কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখে নবিজি ﷺ খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, ঔ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, যদি এই তাওরাতের অধিকারী মুসা আ. এখন জীবিত হন, তবুও তাঁকে আমারই অনুসরণ করতে হবে।[৮]

বর্তমান যুগ ফিতনার যুগ। অন্ধকার রাতের মতো বিভিন্ন ধরণের নব্য ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেগুলোর মধ্যে ভয়ঙ্কর একটি ফিতনা হলো হাদিস অস্বীকারের ফিতনা। যার মূল দাবি হলো, আমরা কেবল কুরআন থেকে প্রমাণিত বিধানের অনুসরণ করব। হাদিস অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই।

নবিজি ﷺ জীবদ্দশাতেই ভয়ঙ্কর এই ফিতনাটি চিহ্নিত করে গেছেন। হজরত আবু রাফে রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, অচিরেই তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি তার গদিবিশিষ্ট আসনে হেলান দিয়ে বসে থাকাবস্থায় তার নিকট আমার নির্দেশিত কোন কর্তব্য বা নিষেধাজ্ঞা পৌঁছবে, তখন সে বলবে, আমি অবহিত নই। আমরা যা আল্লাহর কিতাবে পাব, শুধু তারই অনুসরন করব।[৯]

---

৬. সুরা আলে ইমরান, ৩১
৭. মাদারিজুস সালিকিন, ৩/২২
৮. মুসনাদে আহমাদ, ৩/৩৮৭
৯. সুনানে আবু দাউদ, ৪৬০৫

নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ সাধারণ কোনো ব্যাপার নয়। বরং তা জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকার মাপকাঠি। হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেন, অস্বীকারকারী ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, অস্বীকারকারী ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই অস্বীকারকারী।[১০]

নবিজি ﷺ-এর আনুগত্যের নিয়তে যদি কেউ বিয়ে করে কিংবা সুস্বাদু খাবার খায়, সে-ও সওয়াব পাবে। পক্ষান্তরে তাঁর আনুগত্য উপেক্ষা করে কেউ ইবাদত করলেও তাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন থেকে তাকে বঞ্চিত থাকতে হবে।

হজরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, একবার সাহাবিদের একটি দল নবি-পত্নীদের নিকট নবিজির গোপন আমল ও ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। (তাদের বিবরণ শুনে) এক সাহাবি দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে বললেন, আমি কোনো নারীর সঙ্গে ঘর সংসার করব না। আরেকজন বললেন, আমি কখনও গোশত খাব না। তৃতীয়জন বললেন, আমি কখনও ঘুমাব না। উক্ত তিনজনের দৃঢ় সংকল্প সম্পর্কে অবগত হয়ে নবিজি ﷺ তাদের কাছে আগমন করলেন। আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে তিনি বললেন, লোকজন কিভাবে এমন বিষয় ভাবতে পারে? আমি তো নামাজ পড়ি। ঘুমোতে যাই। রোজা রাখি। ইফতার করি। বিয়ে করি। স্ত্রীদের হকসমূহও আদায় করি। এগুলোই আমার সুন্নাহ। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১১]

সাহাবিদের মাঝে নবিজির আনুগত্যের এমন তীব্র আগ্রহ পরিলক্ষিত হত, যার উপমা পেশ করতে পুরো পৃথিবী অক্ষম। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বণিত, নবিজি ﷺ একটি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলেন। তা দেখে সাহাবিরাও স্বর্ণের আংটি বানালেন। নবিজি ﷺ বললেন, এটা সত্যি যে আমি স্বর্ণের আংটি বানিয়েছিলাম। কিন্তু আজ থেকে আমি আর সেটি পরব না। এটা বলে আংটিটি তিনি হাত থেকে খুলে ফেলে দিলেন। এটা দেখে সাহাবিরাও নিজ নিজ আংটি খুলে ফেলে দিলেন।[১২]

---

১০. সহিহ বুখারি, ৭২৮০

১১. সহিহ মুসলিম,১৪০১

১২. সহিহ বুখারি,৭২৯৮

এমনকি স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়েও সাহাবিরা নবিজির আনুগত্যে অবিচল থাকতেন। হজরত উমর ফারুক একবার কাছে এসে হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি নিছক পাথর। উপকার কিংবা ক্ষতি করার কোনো সাধ্য তোমার নেই। (মূর্তির কারণে পাথরের প্রতি আমার অন্তরে এমন ঘৃণা জন্মেছে যে) নবিজিকে যদি তোমাকে চুমু খেতে না দেখতাম, তাহলে আমিও তোমাকে চুমু দিতাম না।[১৩]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, মাঝে মাঝে হজরত উমর ফারুক রা. কোনো কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করতেন। কিন্তু যখন অবগত হতেন যে, নবিজি ﷺ উক্ত কাজটি করেননি, তখন তিনি সেই কাজ থেকে বিরত থাকতেন।[১৪]

সাহাবায়ে কেরাম রা. এই আনুগত্য ও অনুসণের মাধ্যমেই সুউচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। বর্তমানেও যদি কেউ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য, ভালোবাসা, সন্তুষ্টি ও মারেফাত লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে আনুগত্যের পথেই হাঁটতে হবে। অথচ জনসাধারণের ধ্যান-ধারণায় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের স্তরের ক্ষেত্রে কত রকম অলীক কল্পনা যে বদ্ধমূল রয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষত 'কারামত' বা অলৌকিক ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশকে তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের অবিচ্ছেদ্য অংশই মনে করে থাকে। অথচ আমাদের পূর্বসুরী আলেমগণ মনে করতেন, যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরন করে, সে-ই আল্লাহ তাআলার নিকটতম বান্দা। তারা এটাও বলতেন যে, দীনের বিধি-নিষেধ এবং শরিয়তের সীমারেখার পরিচর্যায় কার চিন্তাধারা কেমন, তা না দেখে তোমরা কোনো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির খপ্পরে পড়ো না। যদিও তাকে বাতাসে উড়তে দেখো।[১৫]

সম্মানিত পাঠক! আসুন, আমরা দীনের প্রতিটি শাখায় নবিজির আনুগত্যের অঙ্গীকার করি। এই আনুগত্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের হেদায়েত ও সফলতা এবং তাওবা গৃহীত হওয়ার নিশ্চয়তা। আরও রয়েছে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থেকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, সন্তুষ্টি ও ক্ষমা প্রাপ্তির অঙ্গীকার।

---

১৩. সহিহ বুখারি,১৫৯৭

১৪. ইগাসাতুল লাহফান, ১/১৩৬

১৫. ইগাসাতুল লাহফান,১/১২৪

কাকুতি-মিনতি

ইবতিহাল বা কাকুতি-মিনতির মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি করা। বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। আল্লাহমুখী হয়ে প্রার্থনা করা। ইবতিহাল শব্দটি থেকেই 'মুবাহালা' শব্দটি উদগত।[১৬] মুবাহালার সারমর্ম হলো, উভয় পক্ষের আল্লাহমুখী হয়ে এই প্রার্থনা করা যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যুক তার ওপর অভিশাপ বর্ষিত হোক।

একবার নাজরান অঞ্চল থেকে ষাটজন খৃষ্টানের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির কাছে এসে হজরত ঈসা আ. সম্পর্কে আলোচনা তুলল। নবিজি ﷺ তাদেরকে একত্ববাদের শিক্ষা এবং হজরত ঈসা আ.-এর প্রকৃত মর্যাদার বিষয়টি তুলে ধরলেন। কিন্তু তারা সত্য গ্রহণ করল না। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাদেরকে মুবাহালার আহ্বান জানালেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

> (হে নবি) আপনি তাদেরকে বলুন, এসো আমরা ডাকি আমাদের সন্তানদেরকে এবং তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে, আমরা আমাদের নারীদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নারীদেরকে, আমরা আমাদের নিজ লোকদেরকে এবং তোমরা তোমাদের নিজ লোকদেরকে। তারপর আমরা সকলে মিলে আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করি এবং যারা মিথ্যাবাদী, তাদের প্রতি আল্লাহর লানত পাঠাই।[১৭]

এই খৃষ্টানরা ছিল মারাত্মক ধুরন্ধর। তাই বাস্তবতা জেনেও তারা মুখে স্বীকার করত না। কারণ, বাস্তবতা মেনে নিলে তাদেরকে মান-সম্মান ও মর্যাদা খুইয়ে

১৬. আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন, ৬৩
১৭. সুরা আলে ইমরান, ৬১

বসতে হবে এবং তারা অন্যের ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না, তাই তারা মুবাহালা করতে অস্বীকৃতি জানাল। তবে তারা নবিজিকে বাৎসরিক কর দিতে সম্মত হলো।

এখানে ইবতিহালের সাথে 'মুবাহালা'র বিশদ আলোচনা জুড়ে দিতে চাচ্ছি না। কেননা ইবতিহাল বা কাকুতি-মিনতি হলো ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এটি মুমিন-মুত্তাকি বান্দার অন্যতম একটি নিদর্শন। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারিম ও হাদিসের আলোকে কিছু আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বান্দাদের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো ইবতিহাল বা কাকুতি-মিনতি। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার সামনে কান্নাকাটি করে, বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ করে প্রার্থনা করে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

> যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের নিকট যখন এটা (কুরআন) পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে যায়। এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে চেহারা লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।[১৮]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

> তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারা নিজ নিজ প্রতিপালককে ভয় ও আশার সাথে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে।[১৯]

আল্লাহ তাআলার সামনে মিনতিপূর্ণ কান্নাকাটি, বিনয়, অক্ষমতা, অপারগতা, দীনতা ও হীনতার বহিঃপ্রকাশেই দাসত্বের গুণটি ফুটে উঠে। মানব সৃষ্টির মূল রহস্যই তো দাসত্ব ও গোলামি করা। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হলো দাসত্বের স্তর। দাসত্বের মাধ্যমেই মানুষ এত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

---

১৮. সুরা বনি ইসরাইল, ১০৭-১০৯

১৯. সুরা সিজদাহ, ৬১

নবিজি ﷺ ছিলেন সৃষ্টিকুলের মাঝে সর্বসেরা। তাঁর যাপিত জীবনের প্রতিটি কাজই দাসত্বের গুণে ছিল পরিপূর্ণ। বিশেষ করে তাঁর দুআগুলো ছিল দাসত্বের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। দুআ করার সময় তাঁর মাঝে মিনতির বিশেষ অবস্থা পরিলক্ষিত হত। দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরত। ঠোঁট দুটি কাঁপত। শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যেত। দু-হাত আকাশের দিকে উঠতে থাকত।

হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, আমি নবিজি ﷺ-কে দুআর সময় দু-হাত ওঠাতে দেখেছি। তিনি দু-হাত এত উপরে ওঠাতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা স্পষ্ট দেখা যেত।[২০]

সিরাতের সাধারণ একজন মুসলিম পাঠকেরও বদর যুদ্ধের সেই বিস্ময়কর চিত্র মনে থাকার কথা। যেখানে মুশরিকদের ছিল এক হাজার জঙ্গি সেনা। অন্যদিকে সহায়-সম্বলহীন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। হজরত উমর ফারুক রা. বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে দু-হাত ছড়িয়ে দিলেন আর এই দুআ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি আপনার ওয়াদা পূর্ণ করুন। যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করেছেন, তা দান করুন। হে আল্লাহ! মুসলিমদের এই দল যদি নিঃশ্বেষ হয়ে যায়, তাহলে আপনার ইবাদত করার মতো আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।[২১]

এই দুআ করার সময় তাঁর কাকুতি-মিনতির এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, কাঁধের চাদরটিও পড়ে গিয়েছিল। তিনি টেরও পাননি। তখন হজরত আবু বকর রা. এসে চাদর উঠিয়ে কাঁধে পেঁচিয়ে দিলেন। বললেন, হে আল্লাহর নবি! এতটুকু দুআই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা নিশ্চয় পূরণ করবেন।[২২]

নবিজি ﷺ-এর সেই দুআটিও অতি বিস্ময়কর ছিল, যখন তিনি নিজ উম্মতের কথা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত উঠিয়েছিলেন। দু-হাত প্রসারিত করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। আমার উম্মতের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহ তাআলা সবকিছু জেনেও জিবরিল আলাইহিস সালামকে বললেন, যাও, মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। জিবরিল আমিন এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি উম্মতের

২০. সহিহ মুসলিম, ৮৯৫
২১. সহিহ মুসলিম, ১৭৬৩
২২. সহিহ বুখারি, ৩৯৫৩

ব্যাপারে চিন্তার বিষয়টি তাঁকে অবহিত করেন। জিবরিল আমিন আল্লাহ তাআলার দরবারে গিয়ে তা জানালে তিনি বললেন, জিবরিল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে আমার এই বার্তা পৌঁছে দাও, আমি উম্মতের ব্যাপারে তাঁকে পরিতুষ্ট করব। অসন্তুষ্ট করব না। তাঁকে পেরেশানিতেও ফেলব না।[২৩]

নবিজি ﷺ-এর প্রতিটি প্রার্থনা কাকুতি-মিনতি, দৃঢ় বিশ্বাস, পরিতুষ্টি, অপারগতা ও অক্ষমতার গুণে পূর্ণ থাকত। তবে শেষ রজনীতে যখন তিনি দুআ করতেন, তখন জলন্ত অঙ্গারে রাখা ডেগের ফুটন্ত পানির মতো আওয়াজ তাঁর বুক ভেঙে বের হত।

কাকুতি-মিনতির মাধ্যমে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট বিদূরিত হয়। আল্লাহ তাআলার সাহায্য আসে। তাঁর অবারিত রহমত জীবনের সঙ্গী হয়। অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। মনে প্রশান্তি আসে। দুআ কবুল হয়। আল্লাহ তাআলা এবং বান্দার মাঝে সম্পর্ক নিবিড় হয়।

মুসলিম জাতির অবস্থা এমন হওয়া উচিত যে, সর্বক্ষণ তার মাঝে কাকুতি-মিনতির অবস্থা বিরাজমান থাকবে। অন্তত দুআর সময় তো থাকতেই হবে। মনে রাখতে হবে, দুর্বল বিশ্বাস, অলসতা, উদাসীনতা ও মনোসংযোগহীন দুআ কিছুতেই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

২৩. সহিহ মুসলিম, ২০২